বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে অপু তার বন্ধু (সম্পর্কে শ্যালকও বটে) প্রণবকে চিঠিতে লিখেছিল :

'কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বলতে পার প্রণব ? বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটি বড়ো ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড়ো বড়ো লোক দিন কাটায়। জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসাতে দেউলে হয়ে পড়ে।'

এ চিঠি পড়লে মনে হয় বিশ্বায়ন-উত্তর যুগের ধস্ত নাগরিক জীবনের কথা শুনছি। ইংরেজিতে যাকে বলে technological slavery, আমরা তেমন দাসত্বকে বহন করে চলেছি আজ। সেলফ আর সেলফি একাকার হয়েছে, বিস্ময়বোধ জেগে ওঠার যেন কোনো পর্ব নেই, জীবনকে আমরা হাজারো যন্ত্রের কলাকৌশলে বেঁধে রোবটীয় মেজাজে কালযাপন করে চলেছি। চিঠি লেখার পর্বও ঘুচেছে অনেককাল, আমাদের বাক্যালাপ এখন ফেসবুকীয়, নয়তো এসএমএস নির্ভর। আমাদের জীবনের অন্তর্গূঢ় মান-অভিমানের পালাপর্ব একদিন বহন করতো নানা কিসিমের চিঠি, সে অভিজ্ঞতাও তো বেশ পুরোনো। অভিমান প্রায়শ মনের অন্দরে জাড্যকে স্থান করে দেয় একথা ঠিক, আবার আত্মমর্যাদাবোধের লক্ষণকেও তো বহন করে অভিমানের রাগরং। চিঠির ভাষা সে কারণেই মনস্তাত্ত্বিক রূপরীতিকে ধারণ করে। মনের আগল খুলে দেয় চিঠি।

যে কথা মন খুলে বলা যায় না, এ সময় সে কথাকে বহন করবে কে, ই-মেল? চিঠির বিকল্প ই-মেল হতে পারে না। কথাগুলো নানা যুক্তিতে মনে আসছিল 'উপন্যাসে পত্রপ্রসঙ্গ' বইটি হাতে পাবার পর। অপু এ চিঠি ছাপা হয়েছে এ বইতে। চিঠির সমাজতত্ত্ব নিয়ে বিলকুল ভেবেছেন এ বইয়ের লেখক সোমা ভদ্র রায়। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিধৃত একাধিক চিঠির প্রসঙ্গকে আলোচ্য করে তুলতেই এ বই। লেখকের কথায় :

'পর যে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবন ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসমস্যাকেন্দ্রিক হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।' ঠিক কথা, ব্যক্তি তো তার সময়কালে নির্মিত ইতিহাসের অংশও বটে, চিঠি সে কারণে নিছক ব্যক্তিগত-র বয়ান নয়।

এ বইয়ের প্রকাশক ব্যঞ্জনবর্গ।